গোপালকৃষ্ণা (মৃত) আইনি প্রতিনিধি দ্বারা এবং অন্যান্যরা

বনাম

নারায়ণগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধি দ্বারা এবং অন্যান্যরা

(২০০৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং১৩৩২)

০৩ রা এপ্রিল ,২০১৯

[অশোক ভূষণ এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

মহীশূর হিন্দু আইন মহিলা অধিকার আইন, ১৯৩৩-ধারা ৪,১০ এবং ১১ - সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮-অনুচ্ছেদ ১৪০, ১৪১ এবং ধারা ২৮-আপীলকারীদের মামলা যে একজন 'আর' নির্ধারিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন-তিনি ১৯০৭ সালে মারা যান-তাঁর দুটি স্ত্রী ছিল 'জে' এবং 'এস'-তাঁর প্রথম স্ত্রী 'জে' থেকে তাঁর একটি কন্যা ছিল 'ভি' এবং 'ভি' এর পরিবর্তে একটি কন্যা ছিল 'আই. কে'-তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁর আগে মারা যান এবং কন্যা 'ভি' ১৯১০ সালে মারা যান-তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী 'এস' ১৯৩৮ সালে মারা যান-আপীলকারীরা ১৯৫৫ সালে 'জে কে' দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তির অধিকার দাবি করেছিলেন - অন্যদিকে, উত্তরদাতারা দাবি করেছেন যে তারা একজন 'এসআর'-এর কাছ থেকে উক্ত সম্পত্তিটি কিনেছিলেন, যিনি পালাক্রমে 'আর' অর্থাৎ 'এস'-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছ থেকে কিনেছিলেন।-উত্তরদাতারা সম্পত্তির দখলে ছিলেন-বিচার আদালত আপিলকারীদের পক্ষে মামলাটি রায় দেয় এবং ১৯৩৮ সালে 'আর' বিধবা, 'এস'-এর মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যাশিত সম্পত্তির মালিক হিসাবে ঘোষণা করে-তবে, প্রথম আপিলে, আপিল আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খুঁজে পায় যে উত্তরদাতারা দখলে ছিল এবং যেহেতু সম্পত্তিগুলি ১২ বছরের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়নি, তাই মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল-হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের রায়কে নিশ্চিত করেছে-আপিলে, স্থির করা হয়েছেঃ ১৯৩৮ সালে, 'এস' মারা গিয়েছিল-এমনকি 'আর'-এর নাতনী 'জেকে' একজন প্রত্যর্পণকারী ছিলেন এই ভিত্তিতেও, ১৯৩৮ সালে 'আর'-এর বিধবা স্ত্রী 'এস'-এর মৃত্যুর পর, তার সম্পত্তি তার উপর ন্যস্ত হয়ে যায় - যদিও এটা সত্য যে দখল পুনরুদ্ধারের মামলার ক্ষেত্রে বিধবার দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলকে বাধ্যতামূলক নয় বলে উপেক্ষা করার জন্য প্রত্যর্পণকারীর জন্য উন্মুক্ত ছিল, আইনে স্পষ্টভাবে ১২ বছরের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সীমার সময়কাল ১৯৩৮ সালে সীমিত মালিকের, অর্থাৎ বিধবার মৃত্যুর সাথে শুরু হয়েছিল - ১৯৩৮ সালে বিধবার মৃত্যুর সাথে সাথে সময় শুরু হয়েছিল - সীমার সময়কাল ১২ বছর ছিল, ১৯৫০ সালে তা শেষ হয়ে গিয়েছিল - সীমা আইন, ১৯০৮ (ধারা ১৪০ এবং ১৪১ অনুসারে) এর অধীনে নির্ধারিত সীমার সময়কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে, কথিত প্রত্যর্পণকারী 'জেকে'-এর অধিকারও শেষ হয়ে গিয়েছিল -

এইভাবে, যখন তিনি ১৯৫৫ সালে আপিলকারীদের পক্ষে বিক্রয়টি কার্যকর করেছিলেন, তখন তিনি কোনও অধিকার জানাতে পারেননি - এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই-হিন্দু আইন-মাদ্রাজ স্কুলের মিতাক্ষরা আইন-সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৩১।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে:১) হিন্দু আইনের অধীনে, একজন বিধবা সীমিত সম্পত্তি নিয়েছিলেন। তিনি রিভারসনারদের ট্রাস্টি ছিলেন না। তিনি সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তবে তিনি কেবল সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধার জন্য সম্পত্তিটি বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন। মহীশূর হিন্দু আইন মহিলা অধিকার আইন, ১৯৩৩ দ্বারা বিধবার সম্পত্তি স্থায়ী হয়ে যায়, যা ১১ ধারার ভিত্তিতে আন্তঃবিবোস স্থানান্তর বা ইচ্ছার মাধ্যমে সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার পরম অধিকার প্রদান করে, রাজ্য আইনটি ০১.০১.১৯৩৪-এ কার্যকর হয়। ১৯০৭ সালে যখন 'আর'-এর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার খোলা হয়, তখন তিনি তাঁর বিধবা 'এস' এবং তাঁর মেয়ে 'ভি' উভয়ের দ্বারা বেঁচে ছিলেন।অতএব, এটা খুব স্পষ্ট যে রাজ্য আইনের ১১ ধারার অধীনে 'এস' একটি পরম অধিকার পাবে না। এই ক্ষেত্রে যখন 'আর' সম্পত্তির উত্তরাধিকার খোলা হয়েছিল, তখন প্রকৃতপক্ষে রাজ্য আইন কার্যকর ছিল না। 'এস' দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিধবার ছিল। অতএব, এটি রাজ্য আইন বা রাজ্য আইনের বিধানগুলির আগে প্রযোজ্য হিন্দু আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক না কেন, 'এস' পরম অধিকার অর্জন করেনি। অতএব, হিন্দু আইনের অধীনে হিন্দু বিধবার অধিকার ছিল তার অধিকার। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৩৯৭-এফ-এইচ; ৩৯৮-এ-বি]

২)এছাড়াও, যতদিন 'আর'-এর 'এস'-বিধবা জীবিত ছিলেন, ততদিন কোনও বিপরীতমুখী ব্যক্তির কোনও স্বার্থ ছিল না। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে 'আর' ('ভি')-এর কন্যা ১৯১০ সালে মারা যান। সেই সময়ে, 'আর'-এর বিধবা * এস 'জীবিত ছিলেন। অতএব, তিনি (' ভি ') সম্পত্তিতে কোনও অধিকার পাবেন না।' এস 'কেবল ১৯৩৮ সালে মারা যান। যখন' এস '১৯৩৮ সালে মারা যান, তখন কোনও সন্দেহ নেই যে' জে কে '('ভি'-এর কন্যা) জীবিত ছিলেন। এখানেই আদালতকে অবশ্যই উত্তরদাতাদের যুক্তি বিবেচনা করতে হবে যে একটি মেয়ের কন্যাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।বিধবার মৃত্যুর পরে যখন উত্তরাধিকার খোলা হয়, এই ক্ষেত্রে, ১৯৩৮ সালে 'এস', যদি 'জে কে' কে শেষ পূর্ণ মালিকের নাতনী হিসাবে বিপরীতকারী হিসাবে বিবেচনা করা যায়, তবে সম্পত্তিটি 'জে কে'-তে ন্যস্ত হবে।[অনুচ্ছেদ ২৩] [৩৮৯-বি-ডি]

৩)আপীলকারীদের জন্য দুটি বাধা থাকবেঃ-প্রথমত, এটি ধরে রাখতে হবে যে 'জে কে' 'আর'-এর নাতনী হওয়ায় 'আর'-এর বিধবা 'এস'-এর মৃত্যুর পরে একটি বিপরীতমুখী ছিল। দ্বিতীয়ত, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যে 'জে কে' ছিল বিপরীতমুখী যে 'এস'-এর মৃত্যুর ১২ বছরের মধ্যে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যধারা চালু করা তার উপর বাধ্যতামূলক ছিল কিনা। [অনুচ্ছেদ ২৪] [৩৯৮-ই]

৪)যদিও এটি কোনও হিন্দু বিধবার দ্বারা করা বিপরীত বিচ্ছিন্নতার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং হিন্দু বিধবার দ্বারা কার্যকর স্থানান্তরের উপর সময়কাল চলতে শুরু করবে না, নিঃসন্দেহে, সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল বিধবার মৃত্যুর পরে শুরু হবে। [অনুচ্ছেদ ২৬] [৪০১-ই-এফ]

৫)১৯১৩ সালে 'আর'-এর বিধবা স্ত্রী 'এস' দ্বারা তার ভাই 'এসআর'-এর পক্ষে সম্পত্তিটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, এটি বিপরীতমুখী ব্যক্তির পক্ষে এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা তাকে আবদ্ধ করে না। [অনুচ্ছেদ ২৭] |৪০১-এফ-জি]

৬) এরপরে, ১৯৩৮ সালে, 'এস' মারা যান। এমনকি 'আর'-এর নাতনী 'জে কে' একজন বিপরীতমুখী ছিলেন এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার পরে, ১৯৩৮ সালে 'আর' বিধবা, 'এস'-এর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রত্যাশিত সম্পত্তি তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়ে যায়। যদিও এটি সত্য যে 'সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মামলা হিসাবে বিধবা দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলকে অবহেলা করা' বিপরীতমুখী 'ছিল, আইনটি স্পষ্টভাবে ১২ বছরের জন্য বিধান করেছিল এবং সীমাবদ্ধ মালিকের মৃত্যুর সাথে সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে বিধবা। ১৯৩৮ সালে বিধবার মৃত্যুর সাথে সাথে সময় শুরু হয়েছিল।সীমাবদ্ধতার সময়কাল ১২ বছর, ১৯৫০ সালে শেষ হয়ে যায়, সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮ (১৪০ এবং ১৪১ অনুচ্ছেদ দ্বারা)-এর অধীনে নির্ধারিত অনুকরণের সময়কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে অভিযুক্ত প্রত্যাহারকারী 'জে কে'-এর অধিকারও শেষ হয়ে যায়। সুতরাং, যখন তিনি ১৯৫৫ সালে আপিলকারীদের পক্ষে বিক্রয় কার্যকর করেছিলেন, তখন তিনি এনওয়াই অধিকার জানাতে পারেননি। এটি ছাড়াও, এক মুহূর্তের জন্যও, সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু হবে ১৯৫৫ সাল থেকে ১২ বছর থেকে যখন 'জে কে' দ্বারা আপিলকারীদের পক্ষে বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হয়েছিল, এমনকি সেই সময়কাল ১৯৬৭ সালে শেষ হয়েছিল।এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৪০১-জি-এইচ; ৪০২-এ-সি; এফ]

জয়শ্রী সাহু বনাম রাজদেওয়ান দুবে ও অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৬২ এস. সি ৮৩: [১৯৬২] এস. সি. আর ৫৫৩; গোগুলা গুরুমূর্তি ও অন্যান্যরা বনাম কুরীমেটি আয়াপ্পা (১৯৭৫) ৪ এস. সি. সি ৪৫৮: [১৯৭৪] ৩. এস. সি. আর ৫৯৫-এর উপর নির্ভরশীল।

কালিপাড়া চক্রবর্তী এবং আরেকজন বনাম পালানি বালা দেবী ও অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৫৩ এস. সি ১২৫: [১৯৫৩] এস. সি. আর ৫০৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৬২] এস. সি. আর ৫৫৩	নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৭৪] ৩ এস. সি. আর ৫৯৫	নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ২১
[১৯৫৩] এস. সি. আর ৫০৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৮ সালের ১৩৩২ নং দেওয়ানি আপিল

বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক হাইকোর্টের ২৮.১১.২০০৫ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, আর.এস.এ. নং ৮৭০/১৯৯৬ সি/ডব্লিউ আর.এস.এ. নং ৮৭১/১৯৯৬।

আপীলকারীদের জন্য ত্রিদীপ পাইস, এন. কে. ভার্মা, প্রণয় জৈন, শ্রীমতী সানিয়া কুমার, শ্রীমতী অঞ্জনা চন্দ্রশেখর আইনজীবীগণ।

এম. গিরিশ কুমার, আনন্দ শ্রীবাস্তব, বিজয় কুমার, আইনজীবীগন উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি

১)বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে দায়ের করা এই আপিলটি নিয়মিত দ্বিতীয় আপিল নম্বর ৮৭০/১৯৯৬ এবং ৮৭১/১৯৬-এ কামাটকা হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত ২৮.১১.২০০৫ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। হাইকোর্ট তার বিতর্কিত রায়ে আপিলগুলি খারিজ করে দেয় এবং প্রথম আপিল আদালতের রায়কে নিশ্চিত করে যা বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত ডিক্রিটিকে উল্টে দিয়েছিল। বিচার আদালত আপীলকারীদের দ্বারা দায়ের করা মামলা [ও. এস. নং. ৬৮/১৯৮৫ এবং ২১/১৯৮৬ (ও. এস. নং. ৩৯৩/৭৫)-এর রায় দেয়।

২)আপীলকারীদের মামলাটি নিম্নরূপঃ -

একজন রামান্না বাদী পক্ষের নির্ধারিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে মারা যান। তিনি জনকম্মার (প্রথম স্ত্রী) সাথে বিবাহিত ছিলেন যিনি তাঁর পূর্বে মারা গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী সীথাম্মা ১৯৩৮ সালে মারা যান। তাঁর প্রথম স্ত্রীর (লক্ষাম্মা) মাধ্যমে তাঁর ভেঙ্কাম্মা নামে একটি কন্যা হয়। ভেঙ্কাম্মা ১৯১০ সালে মারা যান। ভেঙ্কাম্মার জনকাম্মা নামে একটি কন্যা ছিল। আমাদের আগে আপীলকারীরা ১৯৫৫ সালে জনকাম্মা কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তির অধিকার দাবি করেছিলেন।

জানকাম্মার দ্বারা বিক্রি সম্পন্ন হওয়ার পরে, প্রথম বাদী এবং দ্বিতীয় বাদী দাবি করেছিলেন যে তারা মামলা সম্পত্তির দখলে ছিলেন। উত্তরদাতারা তাদের মালিকানা এবং নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন (১৯৫৫ সালের ও. এস. নম্বর ২১১ এবং ২১৩ সহ)। উক্ত মামলাটি বিচার আদালত দ্বারা জারি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আপিলটিতে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের ডিক্রি খারিজ করে দেয় এবং প্রথম বাদী এবং দ্বিতীয় বাদী পক্ষে জানকাম্মার বিক্রয়কে নিশ্চিত করে এবং বলে যে সম্পত্তির মালিকানা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।এটি তাদের মামলা যে যেহেতু ভেঙ্কাম্মা রামান্না থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, জানকাম্মা সম্পত্তির পূর্ণ মালিক হয়ে ওঠেন এবং তার মাধ্যমে বিক্রয় দলিলের অধীনে বাদীরা সম্পূর্ণ মালিকানা দাবি করেন এবং মালিকানা ঘোষণা, দখল এবং মেসন লাভের জন্য মামলা করেন।

অন্যদিকে, উত্তরদাতারা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যে রামান্নার ভেঙ্কাম্মা নামে একটি কন্যা ছিল এবং ভেঙ্কম্মার জানকাম্মা নামে একটি কন্যা ছিল। জানকম্মার মালিকানা অস্বীকার করা হয়েছিল। সীতাম্মা তার ভাই শ্রীনিবাস রাওকে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন।

এটি উত্তরদাতাদের (উত্তরদাতা) আরও একটি মামলা যে তারা শ্রীনিবাস রাওয়ের কাছ থেকে ১৩.০৯.১৯৫৪ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের অধীনে সম্পত্তি কিনেছিল এবং তারপর থেকে তাদের দখলে রয়েছে। তারা প্রতিকূল দখলও দাবি করেছে। পূর্ববর্তী কার্যধারায় হাইকোর্ট পর্যন্ত তাদের দখলে পাওয়া গেছে।

৪)বিচার আদালত মামলাটির রায় দেয় এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খুঁজে পায় যে ভেঙ্কাম্মা রমন্নার কন্যা এবং ভেঙ্কম্মার পাটাম্মা ও জানকাম্মা নামে দুটি কন্যা ছিল। পাটাম্মা মারা যান এবং জানকাম্মা একাই বেঁচে যান। বিচার আদালত আরও তদন্ত করতে এগিয়ে যায় যে জানকাম্মা তার দাদার সম্পত্তিতে কোনও অধিকার অর্জন করেছিলেন কিনা যা বাদীদের কাছে বিচ্ছিন্ন ছিল। আদালত উত্তরদাতাদের দ্বারা শুরু হওয়া পূর্ববর্তী মামলা মোকদ্দমায় হাইকোর্টের নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি উল্লেখ করেছেঃ

"১৭)এখন, সীতাম্মা স্বাধীনভাবে তার স্বামীর কাছ থেকে মামলা সম্পত্তি অর্জনের কোনও অধিকার পেয়েছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখার বিষয়।

এছাড়াও, এই দিকটি মহামান্য হাইকোর্ট ১৬ পৃষ্ঠায় এস. এ. নং ৮০১/৬০-এ বিবেচনা করেছে। উক্ত রায়ে এটি লক্ষ্য করা গেছেঃ-

"এখন এটা উল্লেখ করা উচিত যে, যদিও রামান্না তাঁর স্ত্রী সীতাম্মা, যিনি ১৯৩৮ সালে মারা যান, তাঁকে রেখে গিয়ে কোনও বিতর্ক নেই, তবুও রামান্নার কোনও কন্যা বি জানকাম্মা ছিল কি না, এই বিষয়ে এই মামলাটিতে একটি গুরুতর বিতর্ক ছিল। এর চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন ছিল 'রামান্না যখন ১৯০৭ সালে মারা যান তখন ভেঙ্কাম্মা বেঁচে ছিলেন কি না। নীচের আদালতগুলির দ্বারা নথিভুক্ত অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় যে, মহীশূর হিন্দু মহিলা আইন, সম্পত্তির অধিকার আইনের বিধান অনুসারে সীতাম্মা তাঁর স্বামীর সম্পত্তির পরম মালিক হয়েছিলেন। এই আইনের ধারা ১০ (২) (ছ)-এ বলা হয়েছে যে, রমন্না যখন মারা যান, তখন তিনি যদি তাঁর কন্যা বা কন্যার পুত্র না রেখে যান, যদি ভেঙ্কাম্মা রামানার কন্যা হন এবং রামানার মৃত্যুর সময় তিনি বেঁচে থাকেন, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে,-ডি-র ধারা ১০২) (ছ)-এর কোনও প্রয়োগ নেই এবং সীতাম্মার কেবল একজন বিধবার সম্পত্তি ছিল এবং সম্পত্তিগুলি তাঁর শ্রীধান সম্পত্তি হতে পারে না।এই উদ্দেশ্যেই উত্তরদাতারা যুক্তি দেখান যে রামান্না তাঁর পিছনে তাঁর মেয়ে 'ভেঙ্কাম্মা' রেখে গেছেন এবং ভেঙ্কম্মার একটি সন্তান রয়েছে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী আসামীদের কাছে তাদের কেনা সম্পত্তি জানাতে পারে। উভয় আদালতই জানতে পেরেছে যে ভেঙ্কাম্মা রামান্নার কন্যা ছিলেন এবং সত্যের প্রশ্নের উপর একটি অনুসন্ধান হওয়া অবিরাম রয়ে গেছে। তারা আরও জানতে পেরেছে যে উত্তরদাতা নং ৮ ভেঙ্কাম্মা এর কন্যা জাঙ্কাম্মা এবং সেই অনুসন্ধানটি একই কারণে সমানভাবে অনুপলব্ধ।

১৮)১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, আমি শুধু এই সিদ্ধান্তেই আসিনি যে ভেঙ্কাম্মা তাঁর থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং তিনি রামান্নার কন্যা ছিলেন এবং তাঁর জানকাম্মা নামে একটি কন্যা ছিল, তবে একই পক্ষের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যধারাও এই সত্যটিকে কোনও সন্দেহের ছায়া ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত করেছে। যখন 'ভেঙ্কাম্মা তাঁর বাবা বেঁচে গিয়েছিলেন, যিনি ১৯০৭ সালে মারা গিয়েছিলেন, তখন প্রয়াত রামানার ২' স্ত্রী সীতাম্মা তাঁর স্বামীর সম্পত্তি অনুসন্ধান করে সেখানে থাকতে পারতেন না। কারণ উপরে ইতিমধ্যেই হিন্দু আইন নারীর সম্পত্তি অধিকার আইনের ধারা ১০(২)(ছ) এর অধীনে বলা হয়েছে যে, তিনি তার স্বামী রমন্নের সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হতে পারবেন না।

কারণ রামান্না তাঁর মেয়ে ভেঙ্কাম্মাকে রেখে গিয়েছিলেন। উক্ত ভেঙ্কাম্মা ১৯১০ সালে মারা যান। তাঁর মেয়ের নাম জানকাম্মা রেখে। তাই উক্ত আইনের ১০ (২) (ছ) ধারার অধীনে, সীতাম্মার কেবল একজন বিধবার সম্পত্তি ছিল কিন্তু তাঁর স্বামীর সম্পত্তি তাঁর শ্রীধান সম্পত্তি গঠন করতে পারত না, তাই তাঁর ভাই শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে তাঁর দ্বারা করা কোনও বিচ্ছিন্নতা অবৈধ ছিল।"

৫)যখন ভেঙ্কাম্মা তার বাবার কাছ থেকে বেঁচে যান তখন সীতাম্মা (রমন্নার দ্বিতীয় স্ত্রী) তার স্বামীর সম্পত্তি অর্জন করতে পারেননি। মহীশূর হিন্দু আইন নামকরণ অধিকার আইন, ১৯৩৩ (সংক্ষেপে 'রাজ্য আইন')-এর ধারা ১০ (২) (ছ) -এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। রামান্না তার মেয়ে ভেঙ্কম্মাকে রেখে গেছেন বলে জানতে পেরে, যিনি ১৯১০ সালে মারা গিয়েছিলেন, তাই আইনের ধারা ১০ (২) (ছ) -এর অধীনে, বিধবা সীতাম্মার কেবল বিধবার সম্পত্তি ছিল যা তার স্ত্রীধন সম্পত্তি গঠন করতে পারেনি এবং তাই তার দ্বারা তার ভাইয়ের পক্ষে করা কোনও বিচ্ছিন্নতা-শ্রীনিবাস রাও অবৈধ ছিল।বিধবার সম্পত্তি ছাড়া সীতাম্মার স্বামীর সম্পত্তিতে কোনও স্বার্থান্বেষী স্বার্থ ছিল না, সীতাম্মা নিজে তাঁর স্বামী রমন্নার সম্পত্তিতে কোনও বিক্রয়যোগ্য সুদ অর্জন করেননি। আগের দ্বিতীয় আবেদনে দেখা গেছে যে শ্রীনিবাস রাও দ্বারা উত্তরদাতাদের পক্ষে বিক্রয় বজায় রাখা উচিত নয় এবং সেই অনুযায়ী বিক্রয়টি কেবল আপিলকারীদের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি নিশ্চিত করে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। পূর্ববর্তী কার্যধারায় জানকাম্মার দ্বারা সম্পত্তি বিক্রি বহাল ছিল। এই ভিত্তিতে, সীতাম্মা দ্বারা তার ভাইয়ের পক্ষে সম্পত্তি বিক্রি অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছিল যা বাদীদের মালিক হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার দেয়।

৬)উত্তরদাতাদের যুক্তি ছিল যে, তাদের দখলে ছিল এবং রাজস্ব নথিতেও এই বিষয়ে নথি ছিল। দেখা গেছে যে, রাজস্ব নথিতে থাকা নথিগুলি উত্তরদাতাদের মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।

বিচার আদালত এই প্রশ্নটি বিবেচনা করতে এগিয়ে যায় যে উত্তরদাতা দের দখল প্রতিকূল বলে প্রমাণিত হতে পারে কিনা এবং আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে উত্তরদাতারা প্রতিকূল দখল প্রতিষ্ঠায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিটি সেই অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তদনুসারে, এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, মামলাটি আপিলকারীদের তফসিলি সম্পত্তির মালিক হিসাবে ঘোষণা করে এবং মামলার সম্পত্তির দখল এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মুনাফা পুনরুদ্ধারের অধিকারী ঘোষণা করে ডিক্রি জারি করা হয়।

৭)প্রথম আপিলের ক্ষেত্রে, আপিল আদালত অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে দেখেছে যে উত্তরদাতারা দখলে ছিলেন এবং যদি ১২ বছরের মধ্যে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা হয়, তাহলে [এ. আই. আর ১৯৭২ মহীশূর ২২]-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যদিও হাইকোর্ট আগের দফার মামলা মোকদ্দমায় পর্যবেক্ষণ করেছিল যে ভেঙ্কাম্মা রামান্না বেঁচে গেছেন নাকি তাঁর আগে মারা গেছেন সে সম্পর্কিত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপিলকারীদের অবিলম্বে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল, ১২ বছরেরও বেশি বিলম্বের সাথে এবং তাও বিলম্বের কোনও যথাযথ ব্যাখ্যা না দিয়ে।

দেখা গেছে যে, ১৬.০৪.১৯৫৫-এ জমা হওয়া জানকাম্মার কাছ থেকে বিক্রির মাধ্যমে মালিকানা অর্জনের ভিত্তিতে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আপীলকারীদের অধিকার। ১৬.০৪.১৯৫৫-এ প্রদত্ত পূর্ববর্তী দ্বিতীয় আপিলের হাইকোর্টের রায় কোনও পদক্ষেপের কারণের জন্ম দেয়নি। তদনুসারে, আপিলগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং মামলাগুলি খারিজ করা হয়েছিল।

হাইকোর্টের কার্যধারা

৮)হাইকোর্ট আর.এস.এ. নং ৮৭০/৯৬ এবং আর.এস.এ. নং ৮৭১/৯৬-এ নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্নগুলি গঠন করেছে:

আর.এস.এ. নং. ৮৭০/৯৬

i) প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত যে মামলাটি সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ, তা ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ৬৫ ধারার বিধান বিবেচনা না করেই কি?

ii) উত্তরদাতারা প্রতিকূল দখলদারিত্বের মাধ্যমে তাদের মালিকানা নিখুঁত করেছেন এই সিদ্ধান্তটি ন্যায়সঙ্গত কিনা যখন তারা দাবি করেছেন যে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে তারা সম্পত্তির মালিক?

আরএস. এ. নং ৮৭১/৯৬

i) নিম্ন আপিল আদালত এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল?

ii) নিম্ন আপিল আদালত কি এই ধারণার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, উত্তরদাতারা প্রতিকূল দখলদারিত্বের মাধ্যমে উপাধি অর্জন করেছে?

৯)হাইকোর্ট পক্ষগুলির সম্পর্ক উল্লেখ করার পরে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি পাওয়া গেছে যে, যদিও জানকাম্মার জীবদ্দশায় সম্পত্তিগুলি সীতাম্মা তাঁর ভাই শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে বিক্রি করেছিলেন কিন্তু তিনি এটিকে বিরোধিতা করেননি, তাই শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে উত্তরদাতা দের দ্বারা সম্পত্তির দখল এবং শ্রীনিবাস রাও দ্বারা 'উত্তরদাতাদের পক্ষে' বিরোধিতা করা হয়নি এবং এটি সীমাবদ্ধতার সূচনা বিন্দু হবে।

১০)জানকাম্মা থেকে হস্তান্তরিতরা অর্থাৎ আপিলকারীরা ১৯৭৫,১৯৮৫ এবং ১৯৮৬ সালে আদালতে আবেদন করেছিলেন। মাদ্রাজ স্কুলের মিতাক্ষরা আইন অনুসারে সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনাতে স্থির করা হয়েছে যে বোম্বে রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনও জায়গায় বেঁচে থাকার অধিকার অবশ্যই কন্যা এবং নাতির চেয়ে বিধবার পক্ষে। তাই সীতাম্মা দ্বারা শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে এবং শ্রীনিবাস রাও দ্বারা উত্তরদাতাদের কাছে করা বিচ্ছিন্নতা অবৈধ বলা যায় না

১১)এরপরে, আদালত 'রাজ্য আইন' উল্লেখ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে, রাজ্য আইনের ৪ (১) (ii) ধারা অনুসারেও বিধবা কন্যাদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়, অর্থাৎ বিধবার (সীতাম্মা) অধিকার কন্যার অধিকারের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় এবং জানকাম্মার অবস্থান কেবল তার পরেই আসে। জানকাম্মা-নাতনী উপরোক্ত বিধানের (ix) বিভাগে রয়েছে।

১২)আইনের এই অবস্থানের কারণে, রামান্নার নাতনি জানকাম্মা আপীলকারীদের পক্ষে যে বিক্রয় করেছিলেন, যদি থাকে, তা মূল্যহীন, আরও বেশি, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু জানকাম্মা শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে সীতাম্মা দ্বারা করা পূর্ববর্তী বিক্রয়কে বিরোধিতা করেননি। সীথাম্মার সীমিত আগ্রহ থাকলেও, ৫০ বছর ধরে রামান্নার বিপরীতপন্থীদের দ্বারা বিচ্ছিন্নতা বিরোধিতা করা হয়নি। সীতাম্মার অধিকার অবিসংবাদিত ছিল এবং বিচ্ছিন্নতাও অবিসংবাদিত ছিল।

সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দেখা গেছে যে, প্রথমে জানকাম্মাকে সীতাম্মার বিচ্ছিন্নতাকে বিরোধিতা করতে হয়েছিল, যা ১৯১৩ সালের ছিল। পূর্ববর্তী দ্বিতীয় আপিল (৮০১/১৯৬০ এবং ৮১৯/১৯৬০)-এ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি। যেহেতু সীতাম্মার অধিকার জানকাম্মার দ্বারা বিরোধিতা করা হয়নি, তাই মামলাগুলি অবশ্যই সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ।

এরপরে, প্রতিকূল দখল সম্পর্কে, আদালত স্থির করেছেঃ

"প্রতিকূল দখলের বিষয়টি নিয়ে নিম্ন আপিল আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, এই আদালত দ্বিতীয় আপিল ৮০১/৬০ এবং ৮১৯/৬০-এ ঘোষণার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার পরেও, বাদীরা যথাক্রমে ১৯৮৫ এবং ৮৬ সালে মামলা দায়ের করেন এবং শ্রীনিবাস রাও এবং তারপরে, উত্তরদাতারা প্রতিকূল দখলদারিত্বের মাধ্যমে মামলা সম্পত্তির অধিকার এবং মালিকানা অর্জন করেছেন। এটা বলার দরকার নেই যে যখন এই উত্তরদাতারা কেবল দখলের জন্য নয়, বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতেও তাদের অধিকার স্থাপন করেছে, তখন সেই সিদ্ধান্ত যথাযথ হবে না।"

১৩)আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি। আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শ রাজ্য আইনের ৪ ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তারপরে তিনি আইনের ১০ ধারার সমর্থন চেয়েছেন। আইনের ১০ (২) (ছ) ধারাটি নিম্নরূপঃ-

"১০. (২) স্ত্রিধানের মধ্যে রয়েছেঃ-

(ছ) কোনও মহিলার দ্বারা অন্য কোনও মহিলার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নেওয়া সম্পত্তি এবং কোনও মহিলার দ্বারা তার স্বামী বা পুত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নেওয়া সম্পত্তি, অথবা কোনও পুরুষ আত্মীয়ের কাছ থেকে নেওয়া সম্পত্তি, যদি না সম্পত্তিটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়ার সময় প্রস্তাবকের কোনও কন্যা বা কন্যার পুত্র জীবিত থাকে।

১৪)আপিলকারীর যুক্তি হল যে, হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে গিয়ে স্পষ্ট ভুল করেছে যে, বিধবা সীতাম্মা একটি পরম অধিকার পাবেন। এটি তাঁর যুক্তি যে, স্ত্রীধনের সংজ্ঞা অনুসারে, যা নিঃসন্দেহে তাঁর পরম অধিকার, আইনের ১০ (২) (ছ) ধারায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। যতদূর পর্যন্ত প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তি সীতাম্মা তাঁর স্বামী-রামান্নার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং সেই সময়ে কন্যা ভেঙ্কাম্মা খুব বেশি বেঁচে ছিলেন, অতএব সীতাম্মা একটি পরম অধিকার পাবেন না। এই ক্ষেত্রে, রমণার (ভেঙ্কাম্মা) কন্যা কেবল ১৯১০ সালে মারা গিয়েছিলেন যা রামান্নার মৃত্যুর পরে ছিল-১৯০৭ সালে।১৯০৭ সালে যখন রামানার সম্পত্তির উত্তরাধিকার শুরু হয়, তখন তাঁর বিধবা স্ত্রী সীতাম্মা সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন যেখানে অধিকার কেবল একজন বিধবার সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁর মৃত্যুর পরে, সম্পত্তিটি তাঁর প্রয়াত স্বামী-রামান্নার ফিরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের কাছে ফিরে যায়।

১৫)তার অভিযোগ, হাইকোর্ট আইনের ১০ ধারা উল্লেখ না করে এবং রাজ্য আইনের ৪ ধারার উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে উপেক্ষা করেছে।

রাজ্য আইনের ৪ নং ধারায়, বিধবার কন্যা ও নাতির চেয়ে অগ্রাধিকার রয়েছে।

যখন আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীকে নির্দেশ করা হয় যে ১৯০৭ সালে রামান্না মারা যান এবং ১৯৩৩ সালে আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে রাজ্য আইনটি বিদ্যমান ছিল না, তখন আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরেকটি যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেখান যে মিতাক্ষরা আইনের অধীনে যা প্রযোজ্য ছিল, বিধবা কেবল একটি সীমিত সম্পত্তির অধিকারী ছিল। তিনি যুক্তি দেখান যে রাজ্য আইন পাস হওয়ার আগেই অবস্থানটি ছিল যে বিধবা পরম সম্পত্তি পাননি।

১৬)বিপরীতে, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেবেন যে সীতাম্মা ১৯১৩ সালে সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন।শেথাম্মা ১৯৩৮ সালে মারা যান, যদি তাই হয়, তবে মামলাটি দায়ের করা উচিত ছিল যদি সেই তারিখ থেকে ১২ বছরের মধ্যে যে তারিখে বিপরীতমুখীদের মধ্যে কথিত অধিকার নিহিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে সীথাম্মার মৃত্যুর পরে। ১২ বছরের সময়কাল ১৯৫০ সালে শেষ হয়ে যেত। 'আপিলকারীরা-বাদীরা রামান্নার নাতনী জানকাম্মার কাছ থেকে ৯৫৫ সালে সম্পত্তি কিনেছিলেন। তারপরেও তাদের দ্বারা দায়ের করা মামলাটি ২০ বছরেরও বেশি সময় পরে দায়ের করা হয়েছিল। উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রশ্নযুক্ত অঞ্চলে প্রযোজ্য মিতাক্ষরা আইনের অধীনে নাতনী উত্তরাধিকারী ছিলেন না।শুধুমাত্র একজন পুরুষের কন্যা তার মৃত্যুর পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। অতএব, বিধবা শেথাম্মার জন্য দায়ী সীমিত অধিকারও ডিফল্টরূপে একটি পরম অধিকার হয়ে উঠবে।

পূর্ববর্তী দ্বিতীয় আপিলের ফলাফল

১৭)উত্তরদাতাদের দায়ের করা মামলা থেকে উদ্ভূত পূর্ববর্তী দ্বিতীয় আপিলের ফলাফলগুলি নিম্নরূপঃ হাইকোর্ট ৪ এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি যে শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে সীতাম্মা কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি আসল ছিল। একইভাবে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করেছে যে এই আপিলের উত্তরদাতারা তাদের দ্বারা কেনা সম্পত্তির দখলে ছিল। জানকাম্মাকে রামানার নাতনী হিসাবে পাওয়া গেছে, আরও, আদালত প্রশ্ন উত্থাপন করতে এগিয়ে যায় যে ভেঙ্কাম্মা রামান্নার কন্যা ছিলেন কিনা এবং রাজ্য আইনের ১০ (২) (ছ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রামানার মৃত্যুর সময় তিনি বেঁচে ছিলেন কিনা।এটি লক্ষ্য করা গেছে যে নীচের উভয় আদালতই খুঁজে পেয়েছে যে ভেঙ্কাম্মা রামানার কন্যা এবং জানকাম্মা ভেঙ্কম্মার কন্যা। তবে দেখা গেছে যে

ভেঙ্কাম্মা বেঁচে ছিলেন নাকি রমন্নের আগে মারা গেছেন, সে সম্পর্কে কোনও যুক্তি ছিল না।

১৮)আদালতের অভিমত ছিল যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি ছিল সীতাম্মা তাঁর স্বামীর সম্পত্তির পরম মালিক হন কিনা এবং এটি সমানভাবে সত্য যে তিনি যে প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে এই ধরনের মালিক হতে পারেন তা হবে তাঁর জীবিত থাকার দ্বারা এবং রামানার মৃত্যুর সময় তাঁর কোনও সন্তান বেঁচে না থাকার কারণে। দেখা গেছে যে পক্ষগুলির এই বিষয়ে সমস্ত প্রমাণ পেশ করার সুযোগ ছিল না এবং তদন্তের প্রয়োজন ছিল। সীতাম্মা রামান্নার সম্পত্তির পরম মালিক হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।আদালত অবশ্য জানতে পেরেছিল যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল করার অর্থ এই নয় যে আদালত বলেছিল যে সীতাম্মা পরম মালিক হননি। কোনও মতামত প্রকাশ করা হয়নি কারণ রামান্না মারা যাওয়ার সময় ভেঙ্কাম্মা বেঁচে ছিলেন কিনা এবং এই বিষয়ে উপকরণ অপর্যাপ্ত ছিল এই প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল ছিল।

১৯)এই ভিত্তিতে, উত্তরদাতা দের সম্পত্তির মালিক ঘোষণা করা ডিক্রিটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। আপীলকারীদের উত্তরদাতা দের দখলকে বিঘ্নিত করা থেকে বিরত রাখার ডিক্রিটিও নিশ্চিত করা হয়েছিল। এটি হাইকোর্টের রায় থেকে দেখা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী মামলার রায় থেকে দেখা যায় যে উত্তরদাতারা দখলে ছিল। মালিকানা সম্পর্কিত প্রশ্নটি মূলত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি যা হাইকোর্টের দ্বারা যা পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্ট। আদালত এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রেখেছিল যে রামান্নার কন্যা ভেঙ্কাম্মা বেঁচে না থাকলে সীতাম্মা পরম মালিক হয়ে উঠবেন।

২০)এখন আমরা আমাদের ফলাফলগুলি উপস্থাপন করতে এগিয়ে যাব।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন এবং রাজ্য আইনের আগে একজন হিন্দু বিধবার অবস্থান.

কোনও বিতর্ক নেই যে দলগুলি মাদ্রাজ স্কুলের হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এর অধীনে, প্রতিটি মহিলা যিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে উত্তরাধিকারী হন, পুরুষ বা মহিলা যাই হোক না কেন, তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সীমিত সম্পত্তি নিয়েছিলেন। বিধবার সম্পত্তির ক্ষেত্রে, এই বিবৃতিটি মোল্লা হিন্দু আইন, ২৩ তম সংস্করণে পাওয়া যায়।

"১৭৬)বিধবার সম্পত্তি - একজন বিধবা বা অন্যান্য সীমিত উত্তরাধিকারী আজীবন ভাড়াটে নন, তবে তিনি তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিক, যা বিচ্ছিন্নতার উপর কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে এবং তার মৃত্যুর পর শেষ পূর্ণ মালিকের পরবর্তী উত্তরাধিকারীর উপর ন্যস্ত হওয়ার সাপেক্ষে।

পুরো সম্পত্তি তার উপর ন্যস্ত সময়ের জন্য, এবং তিনি এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করেন। যেমন একটি প্রিভি কাউন্সিল মামলায় বলা হয়েছে, তার অধিকার সম্পত্তির অধিকারের প্রকৃতির; তার অবস্থান মালিকের; সেই চরিত্রে তার ক্ষমতা যতই সীমিত হোক না কেন; কিন্তু যতক্ষণ সে বেঁচে আছে ততক্ষণ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কারও কোনও স্বার্থান্বেষী স্বার্থ নেই।

জয়শ্রী সাহু বনাম রাজদেওয়ান দুবে ও অন্যান্যরা [এআইআর ১৯৬২ এসসি ৮৩],আদালত স্থির করে যে এটি আইনের একটি অনমনীয় প্রস্তাব হতে পারে না যে যখনই কোনও লাভজনক বন্ধক থাকে, তখন বিধবা সম্পত্তিটি এই ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারে না যে এটি প্রত্যাহারকারীদের এটি খালাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আদালত স্থির করেছেঃ

".....এই ধরনের প্রস্তাব কেবল তখনই সমর্থন করা যেতে পারে যখন বিধবা একজন ট্রাস্টির পদে থাকেন, প্রত্যর্পণকারীদের সুবিধার জন্য সম্পত্তির অধিকারী হন, সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং সেগুলি তাদের কাছে অক্ষত রাখার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। তবে, এটি আইন নয়। যখন কোনও বিধবা তার স্বামীর উত্তরাধিকারী হয়, তখন সম্পত্তির মালিকানা তার মধ্যে বৈধ এবং উপকারী উভয়ই থাকে। তিনি সম্পত্তির সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন, এতে প্রত্যর্পণকারীদের স্বার্থ কেবল নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার। বিধবা সম্পত্তির সম্পূর্ণ উপকারী উপভোগের অধিকারী এবং কারও কাছে দায়বদ্ধ নন।এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তিনি প্রয়োজনীয়তার জন্য বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য না হলে সম্পত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না, তবে তাঁর ক্ষমতার উপর এই বিধিনিষেধ 'বিপরীতমুখীদের সুবিধার জন্য আরোপ করা' নয়, বরং হিন্দু আইনের কাছে পরিচিত সম্পত্তির একটি ঘটনা। এই কারণেই বলা হয়েছে যে ক্রাউন যখন সম্পত্তিটি বিচ্ছিন্ন করে নেয় তখন এটি শেষ পুরুষ ধারকের বিধবার দ্বারা করা কোনও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয় যা হিন্দু আইনের অধীনে বৈধ নয়ঃ মসুলিপট্টমের কালেক্টর বনাম কাভালি ভেঙ্কট ৮ মো ইন্ড অ্যাপ ৫২৯ (পিসি)। যেখানে,যাইহোক, একটি স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, হিন্দু আইন দ্বারা বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতার উপর আরোপিত বিধিনিষেধ কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং মালিক হিসাবে বিধবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ বিচক্ষণতা রয়েছে যে বিচ্ছিন্নতা কী রূপ ধারণ করা উচিত। এই বিষয়ে তার ক্ষমতা, হুনুমান পারসাউদ বনাম মুসামত বাবুই মুন্ডরাজ কুনওয়ারী, ৬ মু ইন্ড অ্যাপ ৩৯৩ (পিসি) থেকে শুরু করে একাধিক সিদ্ধান্তে সংরক্ষিত, যা একটি শিশু সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বা যৌথ হিন্দু পরিবারের ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২১)গোগুলা গুরুমূর্তি ও অন্যান্যরা বনাম কুরীমেটি আয়াপ্পা (১৯৭৫) ৪ এস. সি. সি ৪৫৮-এ, এই আদালত একজন হিন্দু বিধবার অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে এবং আমাদের কাছে আরও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে যে বিধবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন উত্তরাধিকারসূত্রে কারও কোনও স্বার্থান্বেষী স্বার্থ নেই।

"একজন হিন্দু বিধবা সম্পত্তির পূর্ণ উপকারী ভোগের অধিকারী। যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অপচয় করার জন্য দোষী নন, তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে পারেন না, তাঁর সম্পত্তি কোনও জীবন-সম্পত্তি নয়, কারণ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তিনি একটি নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ উপাধি দিতে পারেন। এবং এটি কোনও অর্থে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য ট্রাস্টে রাখা সম্পত্তি নয়, তার উপর আরোপিত সীমার মধ্যে, মহিলা ধারকের উপভোগের সর্বাধিক পরম ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি কারও কাছে দায়বদ্ধ নন। তিনি সম্পত্তির সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন। এবং যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন, উত্তরাধিকারসূত্রে কারও কোনও স্বার্থান্বেষী স্বার্থ নেই। এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না যে তার মৃত্যুর সময় কে নিকটতম প্রত্যাবর্তনকারী হবে।অতএব, একজন প্রত্যর্পণকারীর পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া অসম্ভব যে বিধবার অবহেলার কারণে সম্পত্তির যে কোনও ক্ষতির জন্য তাকে বিধবার পৃথক সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। বিধবার মৃত্যুর তারিখে যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কেবল সেই সম্পত্তিই তার পাওয়ার অধিকার রয়েছে, বিধবা তার জীবদ্দশায় প্রয়োজনীয়তার জন্য তার রক্ষণাবেক্ষণ সহ পুরো সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯৩৩ সালের রাজ্য আইনের প্রভাব

রাজ্য আইন যা ১৯৩৩ সালের মহীশূর আইন (যখন এটি পাস হয়েছিল তখন এটি ছিল) ১৯৩৪ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনে কার্যকর হয়েছিল।

ধারা ২ নিম্নরূপ পড়েঃ-

২)(১) এই আইন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা এই আইন পাশ করা ছাড়া, এখানে প্রণীত বিধানগুলির ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা আইনের অধীন হতেন।

(২) পূর্বোক্ত হিসাবে ব্যতীত, এখানে থাকা কোনও কিছুই হিন্দু আইনের কোনও নিয়ম বা ঘটনাকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে না যা এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সুতরাং, হিন্দু আইনের নিয়ম বা ঘটনাগুলি যতদূর পর্যন্ত আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আইনের ধারা (৪) নিম্নরূপ প্রদান করেছে:-

"৪) (১) অবিবাহিত অবস্থায় মারা যাওয়া একজন হিন্দু পুরুষের উত্তরাধিকার, প্রথমত, নীচে উল্লিখিত প্রস্তাবকের পরিবারের সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নিম্নলিখিত ক্রমেঃ-

(i) বিধবা;

(ii) কন্যা;

(ix) কন্যার কন্যা;

ধারা ১০-এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ-

"১০ (১)" স্ত্রীধন "অর্থ কোনও হিন্দু মহিলার সম্পত্তি ব্যতীত প্রতিটি বর্ণনার সম্পত্তি, যেখানে আইন দ্বারা বা কোনও নথির শর্তাবলীর অধীনে তার কেবল একটি সীমিত সম্পত্তি রয়েছে।

১০ (২) স্ত্রিধানের মধ্যে রয়েছেঃ -

(ছ) কোনও মহিলার দ্বারা অন্য কোনও মহিলার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নেওয়া সম্পত্তি এবং কোনও মহিলার দ্বারা তার স্বামী বা পুত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নেওয়া সম্পত্তি, অথবা কোনও পুরুষ আত্মীয়ের কাছ থেকে নেওয়া সম্পত্তি, যদি না সম্পত্তিটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়ার সময় প্রস্তাবকের কোনও কন্যা বা কন্যার পুত্র জীবিত থাকে।

১১ নং ধারাটিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১১ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ -

১১ (১) স্ত্রীধন সম্পত্তির অধিকারী কোনও মহিলার, শুধুমাত্র সংখ্যালঘু থাকাকালীন অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত সাধারণ আইন সাপেক্ষে, ভোগ ও স্বভাব উভয়েরই পরম ও সীমাহীন ক্ষমতা থাকবে।

(২) তার স্ত্রীর বৈধ অভিভাবক হিসাবে কাজ করার সময় ব্যতীত, একজন স্বামীর তার জীবনকালে তার স্ত্রীর স্ত্রীধন-এর কোনও অংশে কোনও অধিকার বা সুদ থাকবে না এবং সে সম্পর্কিত তার কোনও ক্ষমতার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও থাকবে না।

এইভাবে, স্ত্রীধন সম্পত্তির মালিক মহিলাকে উপভোগের ক্ষেত্রেও এর নিষ্পত্তি করার জন্য পরম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। লিসোসাল ইচ্ছাকৃতভাবে বা আন্তঃবিবোস স্থানান্তরের মাধ্যমে হতে পারে। একমাত্র সীমাবদ্ধতা ছিল, অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত আইন সংখ্যালঘু সময়ে চলতে থাকবে। ধারা ১০ (২) (ছ) -তে ফিরে এসে, কোনও মহিলার দ্বারা তার স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিটিকে স্ত্রীধন সংজ্ঞার অধীনে আনা হয়েছিল।

এটি ছিল একজন বিধবার অধিকারের স্পষ্ট সম্প্রসারণ, যার মাধ্যমে একজন বিধবাকে তার স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। এটি হিন্দু আইনের অধীনে বিধবার সম্পত্তি থেকে আমূল বিচ্যুতি, যা ছিল একটি সীমিত সম্পত্তি এবং যার অধীনে নিষ্পত্তির কোনও নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল না। তবে একটি ধরা ছিল এবং এটি ছিল। স্বামী যদি বিধবা এবং একটি কন্যা বা কন্যা পুত্র দ্বারা বেঁচে থাকতেন, তবে হিন্দু আইনে বোঝা বিধবার সম্পত্তি নির্বিঘ্নে চলতে থাকত।উল্লিখিত কোনও কন্যা বা নাতি যদি স্বামী থেকে বেঁচে না থাকেন, তবে ধারা ১০ (১)-এ স্ত্রীধনকে কোনও হিন্দু মহিলার মালিকানাধীন যে কোনও বর্ণনার সম্পত্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা সত্ত্বেও বিধবা পরম অধিকার পাবেন, যা ব্যতীত তাঁর আইন দ্বারা 'কেবল একটি সীমিত সম্পত্তি' রয়েছে। সুতরাং যদিও ধারা ৪-এর অধীনে, বিধবা কন্যা ও কন্যা কন্যার চেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন, তবে অধিকারের প্রকৃতি ধারা ১০ এবং ধারা ১১-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার প্রভাব আমরা আহ্বান করেছি।

২২)পরবর্তী যে বিষয়টি আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে তা হল কে রিভারসনার। রিভারসনাররা হলেন শেষ পূর্ণ মালিকের উত্তরাধিকারী, যারা কোনও বিধবা বা অন্যান্য সীমিত উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর পরে এই ধরনের মালিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী হবে, যদি তারা তখন জীবিত থাকে (হিন্দু আইনের মুল্লার ১৭৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে)।

বিপরীতমুখীদের স্বার্থের প্রকৃতিও একই অনুচ্ছেদের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

(২) প্রত্যাহারকারীদের সুদ-একজন প্রত্যাহারকারীর সুদ সীমিত উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর উপর প্রত্যাশিত সুদ এবং এটি কোনও স্বার্থান্বেষী সুদ নয়। এটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ধারা ৬-এর অর্থের মধ্যে একটি স্বেচ্ছাচারী বা উত্তরাধিকারের একটি নিছক সুযোগ। অতএব, এটি বিক্রি, বন্ধক বা হস্তান্তর করা যাবে না, এবং এটি ত্যাগও করা যাবে না। একটি স্পেস উত্তরাধিকারের স্থানান্তর একটি বাতিলতা. এবং আইনে এর কোনও প্রভাব নেই।

২৩)হিন্দু আইনের অধীনে, একজন বিধবা একটি সীমিত সম্পত্তি নিয়েছিলেন। তিনি রিভারসনারদের ট্রাস্টি ছিলেন না। তিনি সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তবে তিনি কেবল সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধার জন্য সম্পত্তিটি বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন। রাজ্য আইন দ্বারা, বিধবার সম্পত্তি স্থায়ী হয়ে যায়, যা ধারা ১১-এর ভিত্তিতে আন্তঃবিবোস স্থানান্তর বা ইচ্ছার মাধ্যমে সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার পরম অধিকার প্রদান করে। রাজ্য আইনটি ০১.০১.১৯৩৪-এ কার্যকর হয়। ১৯০৭ সালে রামান্নার মৃত্যুর পরে যখন উত্তরাধিকার খোলা হয়, তখন তিনি তাঁর বিধবা সীতা এবং তাঁর কন্যা ভেঙ্কাম্মা উভয়ের দ্বারা বেঁচে ছিলেন।অতএব, এটা স্পষ্ট যে রাজ্য আইনের ১১ ধারার অধীনে সীতামা একটি পরম অধিকার পাবেন না।

এই ক্ষেত্রে যখন উত্তরাধিকার রমন্নের সম্পত্তির জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল, তখন প্রকৃতপক্ষে, সেই সময়ে রাজ্য আইন বলবৎ ছিল না।এই ক্ষেত্রে যখন রমন্নের সম্পত্তির উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হয়েছিল, তখন প্রকৃতপক্ষে রাজ্য আইন কার্যকর ছিল না। সীতামা যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তা ছিল একজন বিধবার সম্পত্তি। অতএব, রাজ্য আইনের পূর্বে প্রযোজ্য হিন্দু আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা রাজ্য আইনের বিধান অনুসারে, সীতামা নিরঙ্কুশ অধিকার অর্জন করেননি। অতএব, তার যে অধিকার ছিল তা হিন্দু আইনের অধীনে হিন্দু বিধবার অধিকার ছিল।

উপরন্তু, যতদিন সীতামা-রমন্নার বিধবা জীবিত ছিলেন, ততদিন কোনও বিপরীতমুখী ব্যক্তির কোনও স্বার্থ ছিল না। রমন্নার (ভেঙ্কাম্মা) কন্যা তাঁর প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে ১৯১০ সালে মারা যান। সেই সময় রমন্নার বিধবা স্ত্রী সীতামা জীবিত ছিলেন। অতএব, তিনি (ভেঙ্কাম্মা) সম্পত্তিতে কোনও অধিকার পাননি। সীতামা কেবল ১৯৩৮ সালে মারা যান। ১৯৩৮ সালে যখন সীতামা মারা যান, তখন কোনও সন্দেহ নেই যে জানকাম্মা বেঁচে ছিলেন। এখানেই আমাদের অবশ্যই উত্তরদাতাদের জন্য বিদ্বান পরামর্শদাতার যুক্তি বিবেচনা করতে হবে যে একটি মেয়ের কন্যাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।বিধবার মৃত্যুর পরে যখন উত্তরাধিকার খোলা হয়, এই ক্ষেত্রে, সীথাম্মাকে ১৯৩৮ সালে, যদি জানকাম্মাকে শেষ পূর্ণ মালিকের নাতনী হিসাবে প্রত্যাবর্তনকারী হিসাবে বিবেচনা করা যায়, তবে সম্পত্তিটি জানকাম্মার উপর ন্যস্ত হবে।

২৪)আপীলকারীদের জন্য দুটি বাধা থাকবেঃ-প্রথমত, এটা ধরে নিতে হবে যে, রমন্নার নাতনী জানকাম্মা রমন্নার বিধবা স্ত্রী সীতাম্মার মৃত্যুর পরে একজন বিপরীতমুখী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যে, জানকাম্মা ছিলেন বিপরীতমুখী, সীতাম্মার মৃত্যুর ১২ বছরের মধ্যে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যধারা চালু করা তার উপর বাধ্যতামূলক ছিল কি না।

২৫)দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে আমরা হিন্দু আইনের উপর মুল্লার নিম্নলিখিত ভাষ্যটি লক্ষ্য করিঃ

২০৭)কোনও বিধবা বা অন্যান্য সীমিত উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী রিভার্সনারদের মামলা এবং তার কাছ থেকে কোনও বিদেশীর কাছ থেকে স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য তার মৃত্যুর ১২ বছরের মধ্যে (ভারতীয় সীমা আইন, ১৯০৮, তফসিল ১, অনুচ্ছেদ ১৪১) এবং সেই তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির মামলা দায়ের করতে হবে।

এখন নতুন সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৬৫,১০৯ এবং ১১৩ অনুচ্ছেদ দেখুন।

প্রত্যাহারকারী বিচ্ছিন্নতার মামলা না করে দখলের জন্য মামলা করতে পারে।' কারণ হল যে কোনও আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই অননুমোদিত বিচ্ছিন্নতাকে বাতিল হিসাবে বিবেচনা করার অধিকার তার রয়েছে।

২৬)উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কালিপাড়া চক্রবর্তী এবং আরেকজন বনাম পালানি বালা দেবী ও অন্যান্যরা ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়ের উপর যথেষ্ট নির্ভরতা রেখেছেন। [এ. আই. আর ১৯৫৩ এস. সি ১২৫]। সেখানে, এই আদালত হিন্দু বিধবা দ্বারা শেবিতির অধিকার স্থানান্তর এবং এটিকে বিরোধিতা করে বিপরীত পক্ষের মামলা নিয়ে কাজ করেছে। এই আদালত নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

"কিন্তু এই বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান ঘটেছিল ফাগো বনাম উৎসব [(১৯২৯) ৫৬ আই.এ. ২৬৭] মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এবং আইনটি এখন পুরোপুরিভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে যে, যদি না হিন্দু মহিলা উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে সীমিত মালিক হিসেবে তার দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায্য ও যথাযথভাবে এবং জালিয়াতি ও যোগসাজশ ছাড়াই একটি ডিক্রি প্রাপ্ত হয়, তাহলে একজন প্রত্যর্পণকারী কর্তৃক এই ধরনের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়েরের কারণ—হয় মহিলা উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে একজন বিদেশীর বিরুদ্ধে অথবা একজন অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে যিনি তার উপর প্রতিকূলভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন—শুধুমাত্র মহিলা উত্তরাধিকারের মৃত্যুর পরই প্রযোজ্য হবে। ১৮৭১ সাল থেকে এই দেশে সীমা আইনে স্বীকৃত এই নীতিটি আমাদের কাছে হিন্দু আইনের স্বীকৃত নীতিগুলির সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রত্যর্পণকারী উত্তরাধিকারীদের অধিকার বিশেষ উত্তরাধিকারের প্রকৃতির,এবং যেহেতু প্রত্যর্পণকারীরা তাদের স্বত্বের সন্ধান করেন না, যদি বিধবা নারী তাদের অধিকার হারাতে বাধ্য হয়, তাহলে তা স্পষ্টতই অন্যায্য হবে - কারণ বিধবা একজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রতিকূল দখলের কারণে সম্পত্তি ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব, এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য সাধারণ নীতি সম্পর্কে শ্রী ঘোষের উত্থাপিত যুক্তিকে যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করা যায় না।

সাধারণত, একজন বিধবার সম্পত্তির উপর দুটি সীমাবদ্ধতা থাকে, প্রথমত, তার বিচ্ছিন্নতার অধিকার সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত, তার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের কাছে নয় বরং শেষ পুরুষ মালিকের উত্তরাধিকারীদের কাছে যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি এআইআর ১৯৬৯ এসসি ২০৪-এর রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে। সেই সময়ে প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতার আইন ছিল ভারতীয় সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮। ১৪০ এবং ১৪১ অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণঃ-

মামলার বিবরণ	*সীমাবদ্ধতার সময়কাল*	*যে সময় থেকে পিরিয়ড শুরু হয়*
১৪০)একজন অবশিষ্টাংশের মালিক এবং প্রত্যর্পণকারী (বাড়িওয়ালা ব্যতীত) অথবা স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য কোনও ব্যবস্থা দ্বারা।	*বারো বছর*	*যখন তার সম্পত্তি দখলে আসে।*
১৪১) একজন হিন্দু বা মুসলিম মহিলার মৃত্যুর পর স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী একজন হিন্দু বা মুসলিম কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার অনুরূপ।	*বারো বছর*	*যখন স্ত্রী মারা যায়।*

এই আদালত কর্তৃক প্রণীত আইনের ভিত্তি এই বিধিবদ্ধ কাঠামোই তৈরি করেছিল যা আমরা লক্ষ্য করেছি।

এটি আইনের ২৮ ধারার প্রজ্ঞাপনের জন্য পরবর্তী প্রাসঙ্গিকঃ -

২৮)সম্পত্তির অধিকারের নির্বাপন-কোনও সম্পত্তির দখলদারিত্বের জন্য মামলা দায়ের করার জন্য কোনও ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ সময়সীমা নির্ধারণের পরে, সেই সম্পত্তির উপর তার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অন্য কথায়, যদিও হিন্দু বিধবার দ্বারা করা বিচ্ছিন্নতা উপেক্ষা করার জন্য প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং সীমাবদ্ধতার সময়কাল হিন্দু বিধবার দ্বারা প্রভাবিত স্থানান্তরের উপর চলতে শুরু করবে না, নিঃসন্দেহে, সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল বিধবার মৃত্যুর পরে শুরু হবে।

২৭)সম্পত্তিটি রামান্নার বিধবা স্ত্রী সীথাম্মা ১৯১৩ সালে তার ভাই শ্রীনিবাস রাওয়ের পক্ষে হস্তান্তর করেছিলেন।নিঃসন্দেহে, এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা যাতে তাকে আবদ্ধ না করে তার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া প্রত্যাবর্তকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল

২৮) এরপরে, ১৯৩৮ সালে, সীতাম্মা মারা যান। এমনকি রামানার নাতনি জানকাম্মা একজন প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার পরেও, ১৯৩৮ সালে রামান্নার বিধবা সীতাম্মার মৃত্যুর পরে তাঁর প্রত্যাশিত সম্পত্তি তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়ে যায়। যদিও এটা সত্য যে, দখল পুনরুদ্ধারের মামলার ক্ষেত্রে, বিধবার দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলকে তার উপর বাধ্যতামূলক নয় বলে উপেক্ষা করার জন্য রিভার্সনারের জন্য উন্মুক্ত ছিল,

আইনে স্পষ্টভাবে ১২ বছরের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সীমাবদ্ধতার সময়কাল ১৯৩৮ সালে সীমিত মালিকের, অর্থাৎ বিধবার মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হয়েছিল।১৯৩৮ সালে বিধবার মৃত্যুর সাথে সাথে সময় কাটতে শুরু করে।১৯৫০ সালে সীমার মেয়াদ ১২ বছর হয়ে যায়। ১৯০৮ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের (১৪০ ও ১৪১ অনুচ্ছেদ) অধীনে নির্ধারিত সীমার বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত প্রত্যাহারকারী জানকাম্মার অধিকারও শেষ হয়ে যায়। সুতরাং, যখন তিনি ১৯৫৫ সালে আপিলকারীদের পক্ষে বিক্রয় কার্যকর করেছিলেন, তখন তিনি কোনও অধিকার জানাতে পারতেন না। তা ছাড়া, এক মুহূর্তের জন্যও, এই ভিত্তিতে অগ্রসর হন যে ১৯৫৫ সাল থেকে ১২ বছর ধরে সীমার মেয়াদ শুরু হবে যখন জানকাম্মার দ্বারা আপিলকারীদের পক্ষে বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হয়েছিল, এমনকি সেই সময়কাল ১৯৬৭ সালেও শেষ হয়েছিল। স্বীকারযোগ্যভাবে, ১৯৬৭ সালের পরেও বেশ কয়েক বছর পরে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৩১ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ-

৩১) নিষিদ্ধ বা বিচারাধীন মামলা সম্পর্কিত বিধান, যেমনঃ-এই আইনের কিছুই থাকবে না-

(ক) ভারতীয় সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৯) দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়সীমা এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে শেষ হয়ে গেছে এমন কোনও মামলা, আপিল বা আবেদন দায়ের, অগ্রাধিকার বা আবেদন করতে সক্ষম করবে; অথবা

(খ) কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনকে প্রভাবিত করে, যা প্রতিষ্ঠিত, পছন্দসই বা আগে করা হয়েছিল এবং এই ধরনের সূচনায় মুলতুবি রয়েছে।

স্পষ্টতই, ১৯৬৩ সালের সীমানা আইন কার্যকর হওয়ার অনেক আগেই মামলা দায়েরের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি ডানপন্থীদের উপর এই ধরনের মামলা দায়ের না করার প্রভাব ছাড়াও।

২৯)এই পরিস্থিতিতে, আমরা হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আপিলগুলি খারিজ হয়ে যাবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ না দিয়ে।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক

এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen